KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 01, Issue : 01, (July - December) 2024
Published On 15th September 2024

অনালোকিত নীলা গ্রামের মৃত্যুঞ্জয়ী বীর আশুতোষ দলুই

দীপঙ্কর নস্কর
সহকারী অধ্যাপক, বিধান চন্দ্র কলেজ, আসানসোল

সারসংক্ষেপ

সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনের পর গান্ধীর অন্যতম রাজনৈতিক অস্ত্র ছিল অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন। লবণ আইন ভঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয় হরতাল, পিকেটিং, মাদক দ্রব্য বর্জন প্রভৃতি। গান্ধীজির এই ডাণ্ডি অভিযান ছিল একটি গণ আন্দোলনের অশনি সঙ্কেত। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বাংলায় প্রাদেশিক কংগ্রেসে চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল। সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতাসহ চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে বিদেশি বস্ত্র বয়কট, সরকারি কর্মচারি বয়কট, ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন, পুলিশের উপর আক্রমণ, রাস্তা কাটা, ব্রিজ ধ্বংস হতে থাকে। গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামাঞ্চলে এই আন্দোলন 'নুনমারা আন্দোলন' নামে পরিচিত হয়। সমগ্র নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল জুড়ে আন্দোলনের ব্যাপ্তি ঘটে এবং ডায়মন্ডহারবার মহকুমায় আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল চরম মাত্রায়। আলোচনার প্রধান কেন্দ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিপ্লব তীর্থ নীলা গ্রাম ও মৃত্যুঞ্জয়ী বীর কিশোর আশুতোষ দলুই। এই আলোচনায় নীলাগ্রাম তথা ডায়মন্ডহারবার মহকুমায় আইন অমান্য আন্দোলনের বিস্তৃত ঘটনার বিশদ বিবরণ এবং মৃত্যুঞ্জয়ী কিশোর বীর আশুতোষ দলুই সম্পর্কে পাঠকদের জ্ঞাত করার প্রয়াস হয়েছে।

সুচকশব্দ : লবণ আইন, সত্যাগ্রহী, নুনমারা আন্দোলন, নীলা গ্রাম, মৃত্যুঞ্জয়ী বীর আশুতোষ দলুই

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসে বাংলার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। এই বিপ্লবী ঐতিহ্যের ধারক বাহক বাংলা মায়ের দামাল সন্তানরা। বাংলার গ্রামে গ্রামে পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য শত শত বীর যোদ্ধারা ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। জাতির জনক গান্ধীজির দূরদর্শিতা ও বাস্তব জ্ঞান সম্পর্কে দেশবাসী বিংশ শতকের শুরুতেই উপলব্ধি করেছিল। সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনের পর গান্ধীর অন্যতম রাজনৈতিক অস্ত্র ছিল অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ গান্ধীর নেতৃত্বে ৭৮ জন সহযোগী আনুষ্ঠানিক ভাবে আইন অমান্য করতে ডাণ্ডি অভিযান করেন। ৫ এপ্রিল ১৯৩০ ডাণ্ডিতে লবণ আইন ভঙ্গ করার দিন গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলন সমগ্র দেশে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। লবণ আইন ভঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয় হরতাল, পিকেটিং, মাদক দ্রব্য বর্জন প্রভৃতি। গান্ধীজির এই ডাণ্ডি অভিযান ছিল একটি গণ আন্দোলনের অশনি সঙ্কেত। কেন্দ্রিয় নেতৃত্বের সঙ্গে আঞ্চলিক নেতৃত্বের বোঝাপড়ার অভাব থাকলেও আইন অমান্য আন্দোলন ভারতবর্ষকে গভীরভাবে স্পর্শ

করেছিল। গান্ধীর প্রতি সাধারণ মানুষের যে অগাধ আস্থা রয়েছে তার একটি বড় প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।[1]

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বাংলায় প্রাদেশিক কংগ্রেসে চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল। সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন।[2] এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতাসহ চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে বিদেশি বস্ত্র বয়কট, সরকারি কর্মচারি বয়কট, ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন, পুলিশের উপর আক্রমণ, রাস্তা কাটা, ব্রিজ ধ্বংস হতে থাকে। আইন অমান্য আন্দোলনের সাধারণ কার্যক্রমের সাথে ভাগচাষি অন্দোলন যুক্ত হয়ে তীব্র আকার ধারণ করে। এই সময় বিভিন্ন জেলা থেকে জেলার নেতৃত্ব দেওয়া ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হলেও আন্দোলনের তীব্রতাকে দমন করা যায়নি।[3]

আলোচনার প্রধান কেন্দ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিপ্লব তীর্থ নীলা গ্রাম ও মৃত্যুঞ্জয়ী বীর কিশোর আশুতোষ দলুই। আলোচ্য সময়ে জেলার সর্বত্র লবণ তৈরি করে আইন ভঙ্গ শুরু হল। প্রান্তিক নদী ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা সমূহে আইন অমান্যের জন্য তরুণ যুবকেরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। দেশজ প্রথায় নোনা মটি থেকে নুন তৈরি এবং তা দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে ব্যবহারই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। বর্তমানেও সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে অনেক বাড়িতে এইভাবে তৈরি নুন ব্যবহার হয়ে থাকে। গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামাঞ্চলে এই আন্দোলন 'নুনমারা আন্দোলন' নামে পরিচিত হয়। সমগ্র নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল জুড়ে আন্দোলনের ব্যাপ্তি ঘটে এবং ডায়মন্ডহারবার মহকুমায় আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল চরম মাত্রায়।

জাতীয় কংগ্রেসের ডায়মন্ডহারবার মহকুমা কমিটি আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং আইন অমান্য কমিটিও গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে গঙ্গাধর হালদার ও অনাথবন্ধু দত্ত। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে অন্যতম রঙ্গলাল মণ্ডল, সারদাপ্রসাদ হালদার, অতুলানন্দ শাসমল প্রমুখ ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর ক্যাপ্টেন তথা অধিনায়ক ছিলেন ডায়মন্ডহারবার থানার বারদ্রোণ গ্রামের অরবিন্দ পুরকাইত ও ফলতা থানার মালা গ্রামের অশ্বিনীদেব সরকার।

ডায়মন্ডহারবারের নীলা গ্রামে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ৬ এপ্রিল প্রথম আইন অমান্য আন্দোলন হয়। সম্ভবত ডায়মন্ডহারবার মহকুমা তথা কলকাতার দক্ষিণে এই আন্দোলনই প্রথম সক্রিয় স্বাধীনতা আন্দোলন। নীলায় আন্দোলন শুরুর পর প্রায় একই সঙ্গে ডায়মন্ডহারবার মহকুমার উপকূলবর্তী সামুদ্রিক এলাকা ও নদী সন্নিকটস্থ অঞ্চলে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি হল ডায়মন্ডহারবারের রামরামপুর, আবাসবেড়ে, কুলপির গাববেড়িয়া, ট্যাংরা, মগরাহাটের হোটর-ধামুয়া, বৈচিবেড়িয়া, সুন্দরবনের নামধানা, কুলপি, ১৫ নম্বর লাট, মথুরাপুরের নালুয়া, কাশীনগর, মণিরতট, রাজপুর, সোনারপুর, হরিনতি, চাংড়িপোতা, গোবিন্দপুর, কালিকাপুর, সাউথ গড়িয়া, মহিষবাথান, সরিষা, বহু, জয়নগর-মজিলপুর প্রভৃতি। সকলেই এই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যোগদান করেন।

'নীলা' একটি অখ্যাত ছোট গ্রাম। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ডায়মন্ডহারবার থানার অন্তর্গত নূরপুর অঞ্চলে অবস্থিত। আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অখ্যাত গ্রাম নীলা রাতারাতি খ্যাতির শিখরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আন্দোলনকে উন্মত্ত করে তুলে ছিল ছোট গ্রামটি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে গ্রামটি চিহ্নিত। ৬ এপ্রিল বিজয়কুমার দত্তের নেতৃত্বে ২৫ জন সত্যাগ্রহী নীলায় লবণ আইন ভঙ্গ করেন। চিংড়িপোতার মধ্য দিয়ে যাবার সময় অন্য একদল সত্যাগ্রহী তাদের দেখে উল্লসিত হন। আগামীকাল সম্ভবত তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে লবণ আইন ভঙ্গ করবেন।[4]

৬ এপ্রিল চিংড়িপোতার দল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নীলায় বিজয়কুমারের নেতৃত্বে যে লবণ আইন ভঙ্গ করেছিল পাশাপাশি আরও দুটি লবণ আইন ভঙ্গ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। শ্রী দত্ত বলেন যে, শুধু লবণ আইন ভঙ্গই নয়, অন্যান্য সরকারি নিয়ম ভঙ্গেরও প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, ইন্টালির একজন ভারতীয় খ্রিস্টান অমরনাথ বিশ্বাস এই লবণ আইন ভঙ্গের সর্বান্তকরণে অংশগ্রহণ করেন।

৯ এপ্রিল এখানে সত্যাগ্রহী শিবিরে গ্রামবাসীরা সত্যাগ্রহীদের সংবর্ধনা দেন। মহিলারা শাঁখ বাজিয়ে ফুল ছড়িয়ে সত্যাগ্রহীদের সম্ভাষণ জানান। ক্যাপ্টেন বিজয় সামন্ত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। ১০ এপ্রিল এখানে বিপুল আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে লবণ তৈরি হয়। ১৮ এপ্রিল এখানে জনসাধারণ এস.ডি.ও.-কে বয়কট করেন। এমনকি অখণ্ড চব্বিশ পরগনার আইন অমান্য সর্বাত্মক হয়ে ওঠে। ১৯ এপ্রিল নীলার পরিবেশ মারাত্মক হয়ে ওঠে এবং ২০ এপ্রিল ডায়মন্ডহারবারের ফুলেশ্বরে Contraband লবণ Sample তৈরি হয়।

সমগ্র ভারতের দৃষ্টি সেদিন নিবদ্ধ ছিল নীলা গ্রামের প্রতি। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ২৪ এপ্রিল স্মরণীয় হয়ে আছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে। অহিংস আন্দোলন দমন করতে পুলিশ সেদিন যেভাবে সহিংস হয়ে উঠেছিল তা অত্যন্ত নির্মম ও বর্বরতা এবং কাপুরুষতার চূড়ান্ত নিদর্শন। ২৪ এপ্রিল লবণ সত্যাগ্রহীদের উপর ভারতের মধ্যে প্রথম গুলিবর্ষণ হল ডায়মন্ডহারবার থানার নীলা গ্রামে। এই গুলি চালনার ঘটনা ছিল সত্যিই নিন্দাজনক। ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ নিষ্ঠুরভাবে গুলি চালিয়ে হনন করে ছিল এক মৃত্যুঞ্জয়ী বীর যুবকের প্রাণ। হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত ছোট গ্রাম নীলার মাটি ওই দিনটিতেই পবিত্র হয়েছিল ষোল বছরের কিশোর আশুতোষ দলুইয়ের রক্তে। সমগ্র ভূ-ভারত সেদিন স্তম্ভিত; ঘটনার তাৎপর্য পর্যালোচনা করে বাংলা, ইংরেজি প্রায় সব সংবাদপত্র ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেছিল।

নীলা গ্রামের আইন অমান্য আন্দোলনের ঘটনা দৈনিক বসুমতী, বঙ্গবাণী, পাইওনিয়ার, অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা, লিবার্টি, এ্যাডভান্স প্রভৃতি সংবাদপত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণসহ প্রকাশিত হয়। একমাত্র স্টেটসম্যান পত্রিকায় যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল তা ছিল ঘটনার বিকৃত রিপোর্ট এবং পুলিশের সাফাই রিপোর্ট। সেখানে নিহত হওয়ার কোন ঘটনার উল্লেখ ছিল না। ২৬ এপ্রিল দৈনিক বসুমতীর সংবাদের শিরোনামে ছিল— "নীলায় জনতার উপর গুলিবর্ষণ। পুলিশ কর্তৃক ১৪৪ ধারা অনুযায়ী সভাভঙ্গ। ১ জন হত ও ৩ জন আহত। গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার।" সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ছাড়াও সরকারি নথিপত্রে তার সাক্ষ্য মেলে।

বিখ্যাত নীলাগ্রাম তথা ডায়মন্ডহারবার মহকুমায় আইন অমান্য আন্দোলনের বিস্তৃত ঘটনার বিশদ বিবরণে যাওয়ার আগে মৃত্যুঞ্জয়ী কিশোর বীর আশুতোষ দলুই সম্পর্কে পাঠকদের জ্ঞাত করা আশু কর্তব্য। ভারতবর্ষের আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম শহিদ কিশোর আশুতোষ দলুই। ডায়মন্ডহারবার মহকুমার হুগলি নদী তীরস্থ নূরপুর অঞ্চলের কাঁকজোল গ্রামের ভূমিপুত্র আশুতোষ। জন্ম ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ। অত্যন্ত দরিদ্র কৃষিজীবি পরিবারের চতুর্থ সন্তান। পিতামহ ভৈরব দলুই ও পিতামহী কুমারী দেবী। তাঁর পিতা নিশিকান্ত দলুই ও মাতা উত্তরাময়ী দেবী। পরিবারের অপর সদস্যরা হলেন- অগ্রজ কালীপন, লালচাঁদ, প্রেমচাঁদ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুদর্শন। সাধারণ খেটেখাওয়া জীবনযাপনে অভ্যস্থ পরিবার। এই গ্রামেই তাঁর শৈশব অতিবাহিত। নিকটবর্তী গোয়ানাড়া গোবিন্দপুরের অদ্বৈত গায়েনের আটচালায় যে স্থানীয় পাঠশালা ছিল সেখানেই তার লেখাপড়া শুরু। পাঠশালার গুরুমশাই ছিলেন কুলটিকারী গ্রামের মুচিরাম মণ্ডল।

হুগলি নদীর চরে বেড়ে ওঠা আশুতোষ লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও শরীরচর্চার দিকে ঝোঁক ছিল। তাঁর প্রিয় খেলা ছিল হা ডু ডু, গজি খেলা, লাঠিখেলা প্রভৃতি। স্থানীয় বন্ধুদের সাথে লেখাপড়া ও খেলাধূলা করত নিয়মিত। এই ভাবে চলছিল তাঁর কৈশোর জীবন। পিতা প্রয়াত হয়েছেন শিশু বয়সে। ফলে দাদাদের কাছে আশ্রয়। মা এবং বড় বউদির প্রাণের প্রিয় ছিল আশুতোষ। মামার বাড়ি ডায়মন্ডহারবার কালীনগরে অবস্থিত।

এই সময় নীলাগ্রামকে কেন্দ্র করে লবণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। কারণ এখানকার বিস্তীর্ণ নদীর চর ও মাটিতে লবণের আধিক্য থাকায় পাশাপাশি গ্রামগুলির মানুষ উৎসাহী হয়ে এখানে জড়ো হতেন। এক কথায় বলা যায় জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধে এই এলাকার মানুষ দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের মধ্যে শুকদেবপুর, কড়াইবেড়িয়া, কাঁকজোল, নূরপুর প্রভৃতি গ্রামের নারীপুরুষ নির্বিশেষে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন লবণ আইন আন্দোলনে। স্থানীয় মহিলারা প্রশাসনিক খবর পৌঁছে দিতেন আন্দোলনকারীদের কাছে।

নীলায় যখন 'নুনমারা আন্দোলন' জোরদার তখন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্বেচ্ছাসেবক ও দেশপ্রেমী মানুষদের ঢল নামত এখানে। কিশোর আশুতোষ অনেকের সঙ্গে প্রায়দিনই কাঁকজোল থেকে নীলায় যেতেন। বিশেষ ঘটনার দিন (২৪ এপ্রিল ১৯৩০) আশুতোষের মা বাড়িতে ছিল না। বিশেষ কাজে মামার বাড়ি কালীনগরে এসেছিলেন। বড় বউদি আশুতোষকে নীলায় যেতে নিষেধ করেন। কারণ তিনি ২৩ এপ্রিল নীলাতে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের লাঠি চালানো ও অনেক স্বেচ্ছাসেবকের আহত হওয়ার খবর শুনেছিলেন। সেই আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে প্রাণের প্রিয় আশুতোষকে ২৪ এপ্রিল নীলাতে না যেতে অনুরোধ করেন। কিন্তু উদ্যাম কিশোর সে কথায় কর্ণপাত না করে বউদির হাতে ভাত খেয়ে ধুতি-গেঞ্জি পরিহিত হয়ে আন্দোলনে যোগ দিতে বেরিয়ে পড়েন। আর ফিরে আসা হয় নি ঘরের ছেলের ঘরে।

নীলা গ্রামের শিবতলায় প্রথম লবণ আইন অমান্যের উদ্দেশ্যে লবণ প্রস্তুত হয়। পরবর্তী সময়ে নদীর তীর বরাবর লবন কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। নীলা গ্রামের আন্দোলন পরিচালনায় প্রধান সহায়ক ছিলেন সারদাচরণ মিদ্যা (দেবশর্মা) এবং তাঁর পুত্র ললিতমোহন মিদ্যা। তাদের বাগানবাড়িতে আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি শিবির গড়া হয়। শিবিরটির নাম দেওয়া হয় "স্বরাজ আশ্রম'। আশ্রমের মূল ভার ছিল ললিতমোহন মিদ্যার উপর। আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক তথা সত্যাগ্রহী ছিলেন ফলতা থানার মালা গ্রামের অশ্বিনী দেবসরকার। তিনি ওই গ্রামের স্বরাজ আশ্রমে থাকতেন।

নীলা গ্রামের আন্দোলনে যোগদানকৃত আগত স্বেচ্ছাসেবকরা প্রথমে জড়ো হতেন ডায়মন্ডহারবারের আইন অমান্য আন্দোলন কমিটির নেতা গঙ্গাধর হালদারের বাড়িতে। সেখানে তারা দলের বৈঠক ও খাওয়া দাওয়া সেরে হাঁটা পথে নীলার উদ্দেশে রওনা দিতেন। এই আগত স্বেচ্ছাসেবীদের পথিমধ্যে সাহায্য সহযোগিতা করতেন সরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও আশ্রমের মহারাজ নির্মোহানন্দজী, মহেশ্বরা গ্রামের প্রিয়নাথ যতি, মাথুর গ্রামের নরেন্দ্রনাথ পুরকাইত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

নীলা গ্রামের শিবতলা ছিল নদীর তীর থেকে সামান্য ভিতরে অবস্থিত। এখানে প্রথম আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তখন 'লণ্ঠন বক্তৃতা' দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের স্বদেশি জাতীয়তাবাদী ভাবনা জাগরিত করা হত। কাঁচে কালো ভূষি লাগিয়ে তাতে ছবি এঁকে পিছনের দিকে আলোকপাতের মাধ্যমে ছবি দেখানো হত। বিভিন্ন ধরনের অত্যাচারের ঘটনা ছবিতে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে মানুষের মধ্যে লণ্ঠন বক্তৃতার উদ্দীপনা সৃষ্টি করাই ছিল লণ্ঠন বক্তৃতা। জ্ঞান নিয়োগী, হরিপদ চক্রবর্তী, বিজয় দত্ত, বসন্ত মণ্ডল, অশ্বিনী দেব সরকার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই কাজে পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিবতলায় লবণ আইন ভঙ্গ করে লবণ তৈরি শুরু হত। দলে দলে নারীপুরুষ এখানে সমবেত হয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ নিতেন।

ফিরে আসা যাক নীলা গ্রামের আন্দোলনের প্রথম দিনের কথায়। একদিকে লবণ তৈরি, অন্যদিকে সত্যাগ্রহ। উভয় ক্ষেত্রে প্রতিবারই হাজার হাজার নারী পুরুষ নীলাগ্রামের আন্দোলনে জমায়েত হত। প্রথম দিনের আন্দোলনেই নীলা গ্রাম প্রায় উত্তাল হয়ে ওঠে। লবণ তৈরি বে-আইনি থাকায় স্বেচ্ছাসেবীদের ভাষায় ছিল এই আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি। নারী পুরুষ উভয়েই নোনা মাটি এনে জমা করতেন স্বরাজ আশ্রমে নুন তৈরির জন্য। স্বেচ্ছাসেবকদের উৎসাহ দিতে দর্শকদের ভিড়ও উপচে পড়েছিল। আন্দোলনের প্রথম দিকের উচ্ছ্বাস স্বেচ্ছাসেবী সত্যাগ্রহীদের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথম দিনের আন্দোলনে পুলিশ ছিল দর্শক মাত্র।

আন্দোলনে বেশিরভাগ অর্থ সংগৃহীত হত ডায়মন্ডহারবার থেকে। সর্বস্তরের মানুষ সাধ্যমতো অর্থদান করতেন দেশ মাতৃকার সেবাতে। স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে আসত চাল, ডাল ও সবজি। ডায়মন্ডহারবার-এর দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের আইনজীবীরা প্রাত্যহিক দিনে রোজগারের একটা অংশ স্বেচ্ছায় দান করতেন। এমন কি অনেক সরকারি কর্মচারি নিঃশব্দে স্বেচ্ছাসেবকদের আন্দোলন তহবিলে অর্থ সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল। নীলায় তৈরি লবণ স্বেচ্ছাসেবকরা প্রকাশ্যে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে বিক্রি করতেন। গাববেড়িয়ার তৈরি লবণ গাববেড়িয়া ও পোলের হাটে, রামরামপুর কেন্দ্রের লবণ ডায়মন্ডহারবার সদরে বিক্রি হতে থাকে। এই সব ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশি নিপীড়ন চলত এবং গ্রেপ্তারের ঘটনা লেগে থাকত।

নীলা গ্রামের আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে স্থল ও জলপথে পার্শ্ববর্তী মেদিনীপুর, হাওড়া ও কলকাতা থেকে প্রচুর মানুষ আসতেন। দর্শকদের উপস্থিতি সত্যাগ্রহীদের মনে এমনভাবে প্রেরণা যুগিয়েছিল যা অনতি বিলম্বে সমগ্র মহকুমায় গণ জাগরণের রূপ নেয়। নীলা গ্রাম অহিংস সংগ্রাম ও জাতীয়তাবাদের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

"ডায়মন্ডহারবারে সত্যাগ্রহ আন্দোলন' এই শিরোনামে আনন্দবাজার পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যায় ২৪ এপ্রিল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ঘটনার বিস্তারিত একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই বিবরণের সঙ্গে আন্দোলন কমিটির সভাপতি গঙ্গাধর হালদারের হাতে ও মাথার ব্যান্ডেজ বাঁধা পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হওয়ার একটি ছবিও প্রকাশিত হয়। আনন্দবাজার পত্রিকায় উল্লেখিত ঘটনার বিবরণে বলা হয়- "নীলায় প্রথম হইতেই পুলিশের অত্যাচার আরম্ভ হয়। সত্যাগ্রহী দল পুলিশ কর্তৃক নির্মম ভাবে প্রহৃত হইত-প্রায় প্রত্যহ ২/৪ জন সাংঘাতিক ভাবে আহত হইত। নিরীহ পথিক ও দর্শক প্রহারের হাত হইতে বাদ পড়ে নাই। এই মহকুমার অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর হালদার ঐ কেন্দ্রে মস্তকে। গুরুতরভাবে আহত হন। মহিলারাও এই কেন্দ্রে পুলিশের হাতে নির্যাতিতা হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিদ্দা প্রমুখ নীলা গ্রামের আন্দোলনের সহায়ক ছিলেন। পুলিশ মিথ্যা অজুহাতে তাঁহাদিগের বাড়িতে হানা দিয়া বহুমূল্যের সম্পত্তি নষ্ট ও অপসারিত করিয়াছিল। নীলায় যতই পুলিশের অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, ততই মহকুমার বিভিন্ন স্থান হইতে আগত দর্শকের দল লবণ কেন্দ্রের জনতার বৃদ্ধি করিতে লাগিল।[5]

অবশেষে ২৪শে এপ্রিল তারিখে পুলিশ জনতার উপর গুলি বর্ষণ করিল ও ফলে আশুতোষ দলুই নামক ষোড়শ বর্ষীয় এক বীর বালক নিহত ও অপর পাঁচজন আহত হয়। যথা- ১. শ্রী মেহের আলি শেখ, ২. শ্রী রজনীকান্ত মণ্ডল, ৩. শ্রী বৃন্দাবন মণ্ডল, ৪. শ্রী গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল। উপরন্ত ঐ দিবসে আরও অনেক পুলিশ কর্তৃক লাঠির আঘাতে আহত হন। তন্মধ্যে ডায়মন্ডহারবারের উকিল শ্রী সারদা প্রসাদ হালদার অন্যতম।

নীলা হইতে মহকুমার আবাল বৃদ্ধ বণিতা এক অপূর্বভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। নীলায় সত্যাগ্রহীদের বীরত্ব কাহিনী প্রশংসনীয়। সত্যাগ্রহীগণ বূহ্যাকারে লবণ পাত্র ও জাতীয় পতাকা রক্ষা করিত। তাহারা প্রহার খাইতে খাইতে সংগাশূন্য হইয়া পড়িত, তথাপি লবণপাত্র ও জাতীয় পতাকা ছাড়িয়া দিত না। মহকুমার বিভিন্ন স্থান হইতে আগত হাজার হাজার দর্শক অহিংস সংগ্রামের এই দৃশ্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়া যে প্রেরণা পাইত তাহা অনতিবিলম্বে সমগ্র মহকুমায় গণ জাগরণরূপে প্রকট হইয়া উঠিল। নীলার লবণকেন্দ্র এই মহকুমার অহিংস সংগ্রাম ও জাতীয়তাবাদের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইল।

ফলে অতি অল্পকাল মধ্যে মহকুমার বহু স্থানে লবণকেন্দ্র স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে সদর থানার রামরামপুর ও আবাসবেড়ে, কুল্পী থানার গাববেড়িয়া ও ট্যাংরা (করঞ্জলি), মগরাহাট থানার হোটর ও বৈঁচবেড়ে, আবাদ অঞ্চলে নামখানা ও ১৫ নম্বর লাট ও মথুরাপুর থানার নালুয়া ও কাশীনগরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাশীনগরে লবণ আইন অমান্যের সঙ্গে সঙ্গে গাঁজা, আফিম দোকানে পিকেটিং, মাদক দ্রব্য বর্জন, খাদি প্রচার ইত্যাদি আন্দোলনও বেশ জোরদার ছিল। অনেকের সঙ্গে অন্যতম কর্ণধার ছিলেন ডাঃ পুলিনবিহারী বৈদ্য,

জীবনহরি চ্যাটার্জী প্রমুখ ব্যক্তিগণ। ডাক্তারি পরীক্ষা শেষে পুলিন বৈদ্য কলকাতা থেকে ফিরে আসেন। নীলায় পুলিশের লাঠিচার্জে আহতদের যখন ডায়মন্ডহারবারে নিয়ে আসা হয় তখন আরও অনেকের সঙ্গে পুলিন বৈদ্যও ছিলেন। আহতদের দেখে তাঁরা বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সোচ্চার হয়ে উঠলে স্টেশনের কাছেই পুলিশ পুলিন বৈদ্যের সঙ্গে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে সরাসরি জেলখানায় নিয়ে যান।

আন্দোলনের প্রারম্ভেই এই মহকুমায় নারীগণের মধ্যে সাড়া পড়িয়া যায়। প্রকাশ্য মহিলা সভায় একটা নারী সত্যাগ্রহ সমিতি গঠিত হয়। উক্ত সমিতি হইতে মহিলা পিকেটারগণ কিছুদিন যাবৎ গাঁজা, আফিম-এর দোকানে পিকেটিং করিয়াছিলেন। হরতালের দিন স্থানীয় মহিলাগণ আদালতে পর্যন্ত পিকেটিং করিয়াছিলেন। নীলা কেন্দ্রে গ্রাম্য নরনারীগণ প্রকাশ্যভাবে সত্যাগ্রহীগণের সহিত লবণ আইন ভঙ্গ করিয়াছিলেন ও পুলিশ কর্তৃক নির্যাতিতা হইয়াছিলেন।

লবণ আইন আন্দোলনের সুফল স্বরূপ এই মহকুমায় বিলাতী কাপড় ও বিলাতী দ্রব্যের ব্যবহার ও কাটতি বিনা পিকেটিং-এ আপনা আপনি প্রভুত পরিমাণে হ্রাস পায়। বর্তমানে মুসলমান প্রধান মগরাহাট অঞ্চল ব্যতীত মহকুমার প্রায় সর্বত্র বিলাতী কাপড়ের চলতি প্রায় লোপ পাইয়াছে। আন্দোলনের পূর্বে এই মহকুমায় খদ্দরের প্রচলন আদৌ ছিল না। এক্ষণে চরকা, তকলী ও খদ্দরের বেশ প্রচলন হইয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীগণের প্রচেষ্টায় 'ডায়মন্ডহারবার খাদি মন্দির' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় খাদি বয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতে কর্মীগণ খদ্দর প্রচারের কার্য করিতেছেন।

আন্দোলনের প্রারম্ভে একমাত্র বাহিরের স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া এই মহকুমায় কার্য্য করিত, কিন্তু কিছুদিন পরে স্থানীয় বালক ও যুবকগণের মধ্যে হইতে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক আসিতে লাগিল। অতঃপর স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, গত জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবারের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে অধিক স্বেচ্ছাসেবক প্রথমে হোটর রিরুটিং ক্যাম্পে এবং সেখান থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধীনে কলিকাতায় পিকেটিংয়ের কার্য্য প্রধানতঃ ডায়মন্ড হারবারের স্বেচ্ছাসেবকগণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"[6]

অর্থাৎ তৎকালীন সংবাদপত্রগুলির পাতায় নীলা গ্রামের ঘটনা বিশেষ স্থান পেয়েছিল নীলার মর্মান্তিক ঘটনার খবর কাঁকজোলে দলুই বাড়িতে পৌঁছাল সন্ধ্যায়। গোবিন্দপুরের স্বেচ্ছাসেবক নীরেন্দ্রনাথ কয়ালের মাধ্যমে। দলুই বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এল; সমগ্র গ্রামজুড়ে দুঃসংবাদের বাতাবরণে শোকস্তব্ধ। আশুতোষের দেহ নিতে বাড়ির সদস্যরা ও কিছু প্রতিবেশী বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর দেহ ছিল স্বরাজ আশ্রমে। মৃতদেহ চাওয়া হলে স্বেচ্ছাসেবকরা বাধ সাধলেন- "আমরাই নিয়ে যাব।"

প্রাতঃকালে মৃতদেহ নিয়ে এগিয়ে চলল মানুষের মিছিল। উদ্দেশ্য আশুতোষের দেহ ময়না তদন্তের জন্য ডায়মন্ডহারবার মর্গে নিয়ে যাওয়া। দীর্ঘ পথে মানুষের ঢল নামল এবং তারা ফুল-মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন বীর শহিদের। ২৫ এপ্রিল মৃতদেহ অপরাহ্নবেলায় মর্গে এসে পৌঁছাল। পরদিন ২৬ এপ্রিল ডায়মন্ডহারবার আইন অমান্য কমিটির সভাপতি আহত গঙ্গাধর হালদারের নেতৃত্বে বিশাল মিছিল সহ শহিদের মৃতদেহ নিয়ে শহর পরিক্রমা শেষে কালীনগর মহাশ্মশানে পৌঁছাল। কিশোর শহিদ আশুতোষ দলুইয়ের দেহকে গঙ্গাতীরস্থ শ্মশানের পবিত্র শিখা আলিঙ্গন করল এবং মা গঙ্গা যেন মহাপ্রাণকে কোলে নিতে অপেক্ষায় রইলেন। তাঁর বিদেহ আত্মার শান্তিকামনায় শ্মশানে প্রজ্বলিত চিতার পাশে জনতার শোকসভা এ এক বিরল ঐতিহাসিক ঘটনা।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল ওই একই দিনে নীলায় শহিদ দিবস পালিত হয়। সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি। শহিদ দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল- স্বরাজ আশ্রম থেকে শোভাযাত্রা, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বিভিন্ন ক্রীড়া প্রদর্শন ও সাধারণ সভা। নীলা গ্রামকে কেন্দ্র করে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছিল

মহকুমার বিভিন্ন স্থানে। এই সময় আন্দোলনের দায়িত্ব ছিল ক্যাপ্টেন অমর বিশ্বাসের উপর। কিন্তু শহিদ দিবসের দিন সভা শুরুর আগে তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তা সত্ত্বেও সভা হয়েছিল। এই সভায় সুভাষচন্দ্র বসুর যোগদানের কথা ছিল। কিন্তু অন্য কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকায় তিনি আসতে পারেন নি। তাই শহিদ আশুতোষের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীলা গ্রামবাসীদের উদ্দেশে একটি চিঠি পাঠান।

"পরম প্রিয় নীলা গ্রামবাসীবৃন্দের প্রতি নিবেদন" এই শিরোনামায় এক মর্মস্পর্শী পড়ে তিনি লেখেন- "আমি বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আশুতোষ দলুই মহাশয়ের স্মৃতি দিবস উপলক্ষে যাহা হইবে তাহাতে আমি যোগদান করিতে পারিব না। আমি বহুদিন পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম যে, আজ আমি অন্যত্র অন্য সভায় যোগদান করিব-সুতরাং প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য আমি আজ নীলায় যাইতে অক্ষম। বলা বাহুল্য যে, আমি প্রতিশ্রুতি দিবার পূর্বে যদি জানিতাম যে নীলায় স্মৃতিনিবস পালনের আয়োজন হইবে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই নীলায় যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতাম এবং অন্য কোনও কাজের ভার গ্রহণ করিতাম না।

আশুতোষ দলুই মহাশয় যে সাহস, বীরত্ব ও স্বদেশ প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন তাহা ভারতের ইতিহাসে বিরল। দেশের জন্য হাসি মুখে তিনি তাঁহার অমূল্য জীবন দিয়া গিয়াছেন- এতদপেক্ষা অধিক দান আর কে নিতে পারে। কিন্তু তিনি মরিয়া অমর হইয়াছেন। তাহার অমরাত্মার বিনাশ নাই---তাঁর গৌরবময় স্মৃতিরও লোপ কোনও দিন হইবে না-তার যশ ও কীর্তি ভারতে অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে সুতরাং আমাদের শোক করিবার কোনও হেতু নাই। তিনি মরিয়া নিজের জীবন ধন্য করিয়াছেন, আত্মীয় স্বজনের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং আমাদের জাতিকে স্বাধীনতার দিকে অগ্রগামী করিয়াছেন। বাস্তবিক এইরকম লোকের সম্বন্ধেই প্রাচীন কবি বলিয়া গিয়াছেন : 'অনেন সূদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি - বাস্তবিক এই রকম লোক পূর্ব্বে হয় নাই বা ভবিষ্যতে হইবে না।

আশুতোষ দলুইয়ের জন্য আজ নীলার নাম সর্ব্বর পরিকীর্তিত হইতেছে। আমি আজ নীলাবাসী মাত্রকেই বলি তাঁহারা যেন আশুতোষের নমে গৌরবান্বিত মনে করেন। আমরা বাঙালি হিসাবেও তাঁর স্মৃতি স্মরণ করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতেছি।

পরিশেষে আমি প্রার্থনা করি যেন সর্বমঙ্গলময় ভগবান তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধেয়া মাতা ঠাকুরানীকে সান্ত্বনা, আশ্বাস ও শান্তি প্রেরণ করেন এবং সঙ্গে আমি আরও প্রার্থনা করি যেন সমগ্র বাঙালি জাতি আশুতোষ দলুই মহাশয়ের অপূর্ব স্মরণ করিয়া অনুপ্রাণিত উদ্বুদ্ধ হন।"[7]

- শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু (২৬/০৪/৩০)

এই ভাবে সেদিনের সেই মর্মান্তিক ঘটনার মধ্য দিয়ে সমগ্র নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলে নীলা গ্রামকে কেন্দ্র করে যে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা আরও ব্যাপ্তি পায়। আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা ঔপনিবেশিক সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। উত্তোরোত্তর আন্দোলনের ব্যাপ্তি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে কিছুদিন পর গান্ধীজি লর্ড আরউইনের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং উভয়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (৫ মার্চ ১৯৩১)। স্বাভাবিক ভাবে সমগ্র নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলে আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়।[8]

স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটলেও হুগলি নদীর চরে অবস্থিত ছোট গ্রাম নীলা তথা ডায়মন্ডহারবারের নাম উজ্জ্বল হয়ে রইল মানুষের হৃদয়ে। সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় দেশপ্রেমের উৎসস্থল এবং জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের আদর্শস্থল ও তীর্থভূমি রূপে চিহ্নিত হয়ে উঠল 'বিপ্লব তীর্থ নীলা'। পরবর্তীকালে 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ' বীর শহিদের স্মরণে শহিদ স্মৃতি স্তম্ভ তৈরি করেন (১৯৭২, ২৪ এপ্রিল)। ওই বছর স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বর্ষে ঐতিহাসিক নীলা গ্রামের গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে পরিষদের তত্ত্বাবধানে ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে নীলা থেকে মশাল নিয়ে সমবেত জনগণ ডায়মন্ডহারবার শহরে উপস্থিত হয় এবং প্রাতঃকালে সেই মশালের প্রজ্বলিত শিখাগ্নিতে ডায়মন্ডহারবারে তৈরি শহিদ স্তম্ভটি ১৫ আগস্ট উদ্বোধন হয়।[9]

লবণকে হাতিয়ার করে গান্ধিজি যে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, যাতে সমগ্র দেশবাসীকে একাত্ম করতে চেয়েছিলেন। ফলে নিম্নগাঙ্গেয় অখণ্ড চব্বিশ পরগনা জুড়ে খে সাড়া জাগিয়েছিল তার সাক্ষ্য বহন করে ইতিহাস। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা যায়, আইন অমান্য আন্দোলন বিপুল সাড়া জাগিয়ে জনমনে প্রভাব বিস্তার করলেও তার অবসান হয়েছিল। হতাশার মধ্য দিয়ে। হায়। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস লিখিত অজস্র পুস্তকের আঞ্চলিকতার এই গুরুত্বপূর্ণ অবদান কোথাও উল্লেখিত হয় না-যা কম বেদনার নয়।

তথ্যসূত্র-

[1] সেন, শুচিব্রত ও ঘোষ, অমিয়; আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৬৪, মিত্রম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮, পৃষ্ঠা- ৩৪

[2] ধর, কৃষ্ণ; ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বাংলা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ৮৭

[3] সরকার, সুমিত; আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭, কে পি বাগচি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ৫৬

[4] ভট্টাচার্য, প্রভাত; (সম্পাদিত)- নব নিম্নবঙ্গ (দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জীবনী সংকলন), রত্নমালা, বিশেষ সংখ্যা, ৯ই জানুয়ারি, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ৪২

[5] পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংখ্যা, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৬, পৃষ্ঠা- ৬৮

[6] নস্কর, দীপঙ্কর; দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিহাস চর্চা, অমর ভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০২১, পৃষ্ঠা- ৩৭৪-৩৭৫

[7] মণ্ডল, অনল; বিপ্লব তীর্থ নীলা, ডায়মন্ডহারবার, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা- ৯৮

[8] ত্রিপাঠী, অমলেশ; গান্ধীজীর প্রাসঙ্গিকতা, দেশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ৩৯

[9] মণ্ডল, নীলরতন; (সম্পাদিত) হীরকদ্যুতি পত্রিকা, ডায়মন্ডহারবার, প্রথম সংখ্যা, অক্টোবর-মার্চ, ২০০৬, পৃষ্ঠা- ১০২